উনিশ শতকের প্রথমে ভারতীয় ভূখণ্ডে বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার, ২০১১-তে তা কমে মাত্র ১৭০৬

বাঘ কমতে থাকলে বাস্তুতন্ত্রেরও সমূহ বিপদ

আগামীকাল আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস। অরণ্যের রক্ষাকর্তা রূপে বাঘের ভূমিকা বিশাল। তাদের সংরক্ষণ বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর সংরক্ষণের জন্য জরুরি। তা সত্ত্বেও সব স্তরের প্রশাসনই উদাসীন। লিখছেন **কৌশিক**

২০ লক্ষ বছর আগে চিনের ভূভাগে প্যান্থেরা টাইগ্রিস বা ভারতীয় বাঘের উৎপত্তি হয় যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আণবিক জিনতত্ত্ব অনুসারে এটা মনে করা হয় যে, ভারতীয় ভূখণ্ডে বাঘের পদার্পণ আনুমানিক ১২০০০ বছর আগে আসামের প্রবেশদ্বার দিয়ে ঘটেছিল। পরে তারা হিমালয় থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার চিরহরিৎ বনাঞ্চল, সুন্দরবনের বাদাবন এবং পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম ভারতের শুষ্ক জঙ্গলে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার মধ্যেও অন্য প্রাণীদের সঙ্গে জীবনযাপন রপ্ত করে নেয়।

উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র শ্রীলঙ্কায় বাঘেরা বিস্তার লাভ করেনি। তারা যখন দক্ষিণ ভারতে পদার্পণ করতে শুরু করে, তত দিনে সমুদ্র এই দুই দেশের মধ্যে সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছে। অন্য দিকে ১৯০৬ সালে সিন্ধুনদীর উপত্যকায় পাকিস্তানের শেষ বাঘটিকে মেরে ফেলা হয়। সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরে হাতি (এলিফাস ম্যাক্সিমাস), গন্ডার (রাইনোসেরস ইউনিকর্নিস), বাঘ (প্যান্থেরা টাইগ্রিস), গাউর (বস গৌরাস) এবং বড়ো ঘাসজমির সমস্ত প্রাণীদের নিদর্শন পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসামের প্রবেশদ্বার দিয়ে অন্য বড়ো স্তন্যপায়ীরা যেমন, সম্বর (রুসা উনিকালার) গাউর (বস গৌরাস), বুনো শুয়োর (সাস স্ক্রোফা) জলা জমির সঙ্গে দেশের অন্য অঞ্চলে বিস্তার জমাতে শুরু করে। অনেক পরে উত্তর-পশ্চিম ভারত মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়, যার সঙ্গে বভিডি প্রাণীরা যেমন চিংকারা (গেজেলা বেন্নেটি), কৃষ্ণসার হরিণ (অ্যান্টিলোপ) নীলগাই (বসেলেফাস ট্র্যাগোকেমেলাস) শুষ্ক পর্ণমোচী ও কাঁটাজঙ্গলে বসতি স্থাপন করে। এই সব প্রজাতির উপস্থিতি বাঘকে উপমহাদেশে ভালো ভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়।

ইতিহাসের পাতায় কোনও নথি না থাকলেও পুরনো শিকারের দলিল ভালো করে ঘাঁটলে বাঘের উপস্থিতির মাত্রার একটা হদিস পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে ১৮৯৫ থেকে ১৯২৫ সালে স্রেফ মধ্য ভারতেই প্রায় ৮০০০০ বাঘকে মেরে ফেলা হয়েছিল। বাঘেরা নেপালের তরাই অঞ্চলেও খুব পরিচিত প্রাণী ছিল, যার দরুণ এদের খুব অল্প সময়ে অনেক বেশি মাত্রায় মারা হয়। ১৯১১-১৯১২ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা ১১ দিনে ৩৯টি বাঘকে হত্যা করেন। আবার ১৯১১-১৯৪০ সালে নেপালের রাজা এবং তাঁর সতীর্থরা ৪৩৩টি বাঘের নিধনযজ্ঞে সামিল ছিলেন।

এ বার একটু অন্য কথায় আসা যাক। প্রকৃতি বা পরিবেশ কী, কাকে বলে? বাঘের সঙ্গে এর যোগসূত্রই বা কতটা? এক কথায় বলতে গেলে প্রকৃতি এই জড় বিশ্বের পুরোটাই। মানুষের ক্রিয়াকলাপের বাইরেও প্রকৃতি বর্তমান। মানুষ প্রকৃতির দয়ায় বেঁচে থেকেও তার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। সে নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করতে চায়। সত্যিটা হল, মানুষ চাক বা না-চাক, সে প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতি যেমন সুন্দর ও সুসংবদ্ধ, তেমনই ভয়ঙ্কর। বর্তমানে একমাত্র মানুষের দ্বারাই সে বিপদগ্রস্ত, কারণ মানুষ আর নিজেকে তার অংশ বলে মনে করে না। প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষকে ক্ষমতার দাস করে ফেলেছে, যার ফলে এই গ্রহ এখন তাদের খামখেয়ালিপনায় ভরা, যেমন, অম্লবৃষ্টি, ধোঁয়াশা, তেজস্ক্রিয় দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সকল মনুষ্যনির্মিত পরিবেশগত সমস্যা শুধু প্রযুক্তি দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের চিন্তাধারায় ও ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। নিজেদের কর্মযজ্ঞ খতিয়ে দেখে ভালো করে পরিবেশ ও তার নৈতিকতাকে বোঝা দরকার। মানুষ আর প্রকৃতির সুসম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

বাঘ শিকার করার পরে সস্ত্রীক লর্ড কার্জন

সাম্প্রতিক কালে একটি সমীক্ষায় পৃথিবীর সব থেকে পছন্দসই প্রাণী হিসেবে বাঘের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। একশো জনে ২১ জনই বাঘ পছন্দ করেন। এর পরেই জনপ্রিয় হল কুকুর, একশো জনে কুড়ি জনেরই পছন্দের তালিকায়। তারপরে শুশুক (১৩%), ঘোড়া (১০%), সিংহ (৯%) এবং সাপ (৮%)। মানতে অসুবিধা নেই, এই পৃথিবীর সব থেকে সহজাত দক্ষতা-সম্পন্ন প্রাণী হল বাঘ।

দেশের অধিকাংশ সংরক্ষিত এলাকা পরিকল্পনাহীন, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় ভরা। কড়া আইন থাকলেও জঙ্গল ধ্বংস আটকাতে নেতারা এগিয়ে আসেন না। যতই হোক, বাঘ তো ইভিএম-এর বোতাম টেপে না।

শুধু কি এই কারণেই বাঘের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়? না। সব থেকে বড়ো কারণ হল, জীব-বৈচিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার পেছনে বাঘের অবদান অনস্বীকার্য। বাঘ বংশগত বৈচিত্রের রক্ষাকর্তা। এর সংরক্ষণ বাস্তুতন্ত্রের অন্য জীবগোষ্ঠীর সংরক্ষণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তাই সঠিক ভাবে পরিকল্পিত ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অন্য বড়ো প্রজাতিদেরও বাঁচাতে সক্ষম। বাঘের সংখ্যায় হ্রাস মানে বাস্তুতন্ত্রেরও বিপদ। বৃষ্টি বা বর্ষার পেছনেও বাঘের একটি বড়ো অবদান রয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে জঙ্গলের রক্ষাকর্তা হিসেবে বাঘের বিপুল ভূমিকা।

বেশির ভাগ মানুষ বুঝতেই পারে না যে একটি জীবিত প্রজাতি (স্তন্যপায়ী, পাখি বা পতঙ্গ) রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাঘ জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করে। ভারতে পর্যটন ব্যবসা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এক বড়ো সাফল্যের বিষয়। আর এই অর্থনীতিতে বাঘের অবদান তাজমহলের পরেই। দেশের অর্থভাণ্ডারে বাঘ প্রতিনিয়ত টাকার জোগান দিয়ে চলেছে। যে সব জঙ্গলে বাঘ আছে, সেখানে পর্যটকের সংখ্যাও বেশি, যা স্থানীয় মানুষের জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা ঘুরতে গিয়ে বাঘ দেখে ফিরে আসেন তাঁদের প্রাপ্তি, একজন বাঘ না-দেখা মানুষের সঙ্গে সহজেই তুলনীয়।

এত কিছুর পরেও বাঘ আজ কোণঠাসা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জঙ্গল কেটে কৃষিজমি হওয়ার দরুণ বাঘ জঙ্গলে আবদ্ধ। উনিশ শতক শুরুর দিকে ভারতে আনুমানিক ৪০০০০ বাঘের বাসস্থান ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, বাসস্থান, কলকারখানা এবং চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাঘকে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলিতে বর্তমান সামাজিক পরিবেশে বাঘকে আনুমানিক ৪ লক্ষ বর্গকিমির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে দেখা যায়। এর মধ্যে প্রজননের জন্য মাত্র ৪ লক্ষ বর্গকিমি অঞ্চল বাঘের আয়ত্তে রয়েছে, আগে প্রজননের জন্য যতটা জায়গা জুড়ে থাকত বাঘ, তার মাত্র ১ শতাংশ এই ৪ লক্ষ বর্গকিমি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ব্যাপ্তি, জঙ্গলের ক্ষয়ক্ষতি দাবানলের মতো বেড়ে গেছে, যার ফলস্বরূপ বাঘের মতো বড়ো মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমেছে। ২০১১ সালের এনটিসিএ-র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ১৮টি রাজ্যের ব্যাঘ্রসুমারিতে বাঘের সংখ্যা ১৭০৬টি, যার সম্ভাব্য বাসস্থান মাত্র ৩,৭৮,১১৮ বর্গকিমি।

বর্তমানে ভারতে মাত্র ৭ শতাংশ এলাকার মধ্যেই বাঘের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ, বাঘ বিবর্তনের ইতিহাসে সব থেকে বড়ো সংকটের সম্মুখীন। পৃথিবীর সব থেকে বেশি বাঘের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশগুলিতে বাঘের আবাসস্থল গোটা এলাকার মাত্র ১১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও মনে করা হয়, সঠিক সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই সংখ্যাকে ১৭০৬ থেকে ৩৫০০ বা তার বেশি সংখ্যায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অনেকেই মনে করেন, দেশের এত আর্থ-সামাজিক সমস্যার মধ্যে এটি করা কঠিন। তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে এই পরিকল্পনা কিন্তু ভারত ১৯৭০ সালে খুব ভালো ভাবেই করে দেখিয়েছিল। শুধু তখন দেশের মুখ্য ব্যক্তির কাছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাঘ, সবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এখন মুখ্য ব্যক্তিরা সব কিছু কেটে পরিষ্কার করে স্বচ্ছতা আনতে পারলেই 'আচ্ছে দিন' আসবে বলে মনে করেন।

এ ছাড়াও উপমহাদেশে বাঘের সব থেকে বড়ো ভয় বা হুমকি, আন্তর্জাতিক বাজারে সরাসরি দেহাংশের ব্যবসা। এর সব থেকে বড়ো এবং সম্ভাব্য কারণ কঠোর আইনের অনুপস্থিতি। দেশের বিভিন্ন সংরক্ষিত অঞ্চল থেকে চিন, তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সরাসরি যোগসূত্র এই চাহিদা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাঘ সংরক্ষণের জন্য যে উদাসীনতা এবং অবহেলা দেখা যায় তা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে বাঘ সংরক্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সমাজের সব স্তরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য যে পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তাতে জঙ্গল বা জঙ্গলের প্রাণীরা কত দিন টিকে থাকতে পারবে সেটাই দেখার। সরকার যে ভূমিকা নিয়ে বসে আছে তাতে আগামী দিনে দেশে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁধ, রাস্তা এবং বড়ো বড়ো কলকারখানা ছাড়া আর কিছুই থাকবে কি? তার কারণ, সরকার জানে গাছ লাগানো বা বাঁচানোর তুলনায় গাছ কাটলে বেশি অর্থ উপার্জন হয়।

এই জনবহুল আবাসস্থলে বাঘ, তার খাদ্য এবং বাসস্থানের আর একটা বড়ো বিপদ হল বিপুল হারে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন। সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় সহযোগিতা দূরে সরে যাওয়া ভারতীয় বন্যপ্রাণের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। সংরক্ষণবিদ ও অরণ্য-প্রশাসন মানুষ এবং বন্যপ্রাণের সংঘাতকে চিরকালই খুব তুচ্ছ ভাবে দেখে এসেছে, বিশেষ করে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে। যার দরুণ স্থানীয়দের বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেছে। দেশের অধিকাংশ সংরক্ষিত এলাকা পরিকল্পনাহীন, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় ভরা। দেশের সংবিধানে কড়া আইন থাকলেও জঙ্গলের ধ্বংস আটকাতে নেতারা কখনও এগিয়ে আসেন না। যতই হোক, বাঘ তো আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভিজে, রোদে পুড়ে ইভিএম-এর বোতাম টেপে না।

ভারতে বাঘ সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। এই অবশিষ্ট বাসস্থানে বাঘকে বাঁচতে গেলে, প্রসারিত ভূখণ্ডের জমিগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করতে হবে। বাঘ, বাঘের খাদ্য, দু'টিই চোরাশিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। জঙ্গল বা সংরক্ষিত এলাকার উপর মানুষের নির্ভরতা কমাতে হবে। যত্রতত্র বনাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে হবে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বাঘকে জীবনধারণের জন্য নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ করতে দিতে হবে। বাঘের গোপনীয়তার ব্যাঘাত না করে তাকে সুস্থ ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঁচতে দিতে হবে। এটা মানতেই হবে যে সব থেকে বড়ো বিড়ালের জন্য অনেক তীব্রতর প্রতিযোগিতা অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে নিজের ভূখণ্ডে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে।